মুমিনের জেলখানা

অধ্যাপক গোলাম আযম

মুমিনের জেলখানা

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

দশম : এপ্রিল ২০১৫
কামিয়াব সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৬
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৩

মুমিনের জেলখানা ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৫১ রিসোর্সফুল পল্টন সিটি (৮ম তলা), পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ স্বত্ব: লেখক ❖ প্রচ্ছদ: কামিয়াব কম্পিউটার ❖ মুদ্রণ: জননী প্রিন্টার্স প্রিন্টার্স, ১৯ প্রতাপ দাস লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।

www.kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন (নিচতলা), ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
৪২৩ ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড (৩য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য: দশ টাকা মাত্র

এ বইটির পটভূমি

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন ১৯৯৩ সালে যে পর্যায়ে পৌছেছে তাতে স্বাভাবিক কারণেই ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে উঠেছে। এ সংঘর্ষ বাড়ারই সম্ভাবনা। ইসলামের বিজয় পর্যন্ত হক ও বাতিলের লড়াই চলতেই থাকবে। এটাই আল্লাহর বিধান। তাই ইসলামী আন্দোলনে যারা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে তাদের উপর সন্ত্রাস ও জেল-যুলুম চলবেই। আমাদের মধ্যে এ পর্যন্ত যারা জেলের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তারা আবার জেলে গেলে পূর্ব-অভিজ্ঞতার কারণে জেল জীবন থেকে যথেষ্ট ফায়দা হাসিল করতে পারবেন। যারা প্রথম বার জেলে যাবেন তাদের জন্য আমার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু কথা পেশ করাই এ বইটির উদ্দেশ্য।

১৯৯২ সালের মার্চ মাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আসবার আগে আরও তিনবার জেলে আসার সৌভাগ্য হয়েছে। ১৯৫২ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজে শিক্ষকতা করার সময় ভাষা-আন্দোলনের কারণে রংপুর জেলে রাজবন্দি (নিরাপত্তা বন্দি) হিসেবে প্রথম জেল জীবনের অভিজ্ঞতা হয়। ১৯৫৫ সালের মার্চে রংপুরেই আবার জেলে যেতে হয়। এর এক বছর আগে আমি জামায়াতে ইসলামী-তে যোগদান করেছি। হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করে মুক্তি পেয়েছি। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে আইয়ূব খাঁর শাসনামলে জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং পূর্ব-পাকিস্তানের ১৩ জনসহ মোট ৬০ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমি ও মাওলানা আবদুর রহীম তখন লাহোর থাকায় সেখানেই আমরা গ্রেপ্তার হই। দু'মাস পর আমাদেরকে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এখানে আরও পাঁচ মাস থাকার পর হাইকোর্টের মাধ্যমেই মুক্তি পাই।

এ চারবারের জেল জীবন থেকে এমন কিছু কথা এখানে পেশ করছি, যা ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদ ও অন্যান্য মুমিনদের মধ্যে যাদেরকে জেলে আসতে হতে পারে তাদের উপকারে আসবে বলে আমার ধারণা। এ লেখা দ্বারা জেলে আসার প্রতি উৎসাহ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু জেলের ভয়ে যেন কোন ঈমানদার কখনো দুর্বলতার শিকার না হন সে উদ্দেশ্যেই এ নিবেদন।

গোলাম আযম

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

সূচিপত্র

দুনিয়াটাই জেলখানা

রাসূল (স) বলেছেন, "দুনিয়াটা মুমিনের জন্য জেলখানা ও কাফিরদের জন্য বেহেশত।" এর সহজ-সরল অর্থ হল, যে কাফির দুনিয়াটাকে বেহেশতের মতোই চিরস্থায়ী মনে করে এবং সব সময় মজা লুটবার তালেই থাকে, এ দুনিয়া ছেড়ে যে চলে যেতে হবে এবং দুনিয়ার জীবনের হিসাব যে পরপারে দিতে হবে সে হিসাব সে করে না। তাই সে জীবনে নৈতিক সীমা মেনে চলার প্রয়োজন মনে করে না। কিন্তু মুমিন আখিরাতের জীবনকেই চিরস্থায়ী মনে করে এবং দুনিয়ার জীবনকে ক্ষণস্থায়ী জেনেই আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পালন করতে থাকে। যাবজ্জীবনের কারাদণ্ড যে ভোগ করে সেও জেলখানাকে তার নিজের বাড়ি মনে করে না। জেলের দালানে শুয়েও সে তার কুঁড়েঘরের বাড়িটিরই স্বপ্ন দেখে। মুমিনও তেমনি দুনিয়াকে তার আসল বাড়ি মনে করে না। সে বেহেশতের বাড়ির কামনা-বাসনা নিয়েই দুনিয়ার জীবনটা কাটায়।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েম করার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নবীগণ হাজারো রকমের যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছেন। সবার ইতিহাস তো জানার উপায় নেই। তবে কয়েকজন নবীকে জেলেও যেতে হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কেই বিশেষভাবে কুরআনে পাকে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বনবী ও শেষ নবীর জেল জীবন ছিল সবচেয়ে কষ্টদায়ক। নবুওয়াতের ৮ম, ৯ম ও ১০ম—এ তিনটি বছর শিআবে আবী তালিব নামক উপত্যকায় বনী হাশিমের গোটা বংশকে মক্কার কাফিররা এমনভাবে আটক করে রেখেছিল যে, বাইরে থেকে কোন খাবার এমনকি পানি পর্যন্ত পৌঁছাতে দেয়নি।

দীনের পতাকাবাহী বহু ইমাম, মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ ও মুজাহিদ মুসলিম নামধারী স্বেচ্ছাচারী শাসকদের জেলে নির্যাতিত হয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালেক (র), ইমাম হাম্বল (র), মুজাদ্দিদে আলফে সানী তাঁদেরই কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

এ যুগে বিশ্বের বহু দেশে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও মুজাহিদগণকে বিনাবিচারে জেলে আটকে রাখা হয়েছে। প্রহসনমূলক বিচার অনুষ্ঠান করে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের বেশ কয়েকজন নেতাকে মিসরে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। আলজিরিয়ায় হাজার হাজার মুজাহিদ জেলে নির্যাতিত হচ্ছেন। মাওলানা মওদূদী (র)-কেও জেলে কয়েক বছর কাটাতে হয়েছে।

বিভিন্ন কারণে জেল

মুমিনদেরকে বিভিন্ন কারণেই জেলে আটক করে রাখা হতে পারে। যে কারণেই হোক মুমিন জেলে থাকতে বাধ্য হলে তার জেল জীবনটা যাতে তার জন্য সত্যিকার কল্যাণ বয়ে আনে সে বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। কয়েক কারণে জেল হতে পারে ঃ

১. রাজনৈতিক কারণ ঃ সরকার ইসলামী আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে অথবা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য কোন মুমিনকে বিনাবিচারে জেলে আটক রাখতে পারে। এ জাতীয় জেল সবচেয়ে সম্মানজনক। জেল কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ তাদেরকে শ্রদ্ধা করে এবং সে হিসেবেই তার সাথে ব্যবহার করে।

২. কোন মিথ্যা মামলায় সাজা পেয়েও কোন মুমিন জেলে আসতে বাধ্য হতে পারে। জেলের পরিবেশে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের মধ্যে যারা নির্দোষ তাদেরকে সবাই সে হিসেবেই জানে। কারণ কয়েদিরা সাজা হয়ে যাবার পর নিজের কোন অপরাধের কথা অস্বীকার করে না। কে কী অপরাধ করে জেলে এসেছে এটা সহজেই জানাজানি হয়। তাই যারা বিনা অপরাধে জেলে আসে তাদের কথাও সবাই জানে।

৩. অপরাধের সাজা পেয়েও কোন মুমিন জেলে আসতে পারে। কোন দুর্বলতার কারণে অপরাধ করলেও মুমিন হওয়ার কারণে তারও জেল জীবন মুমিনের মতোই কাটাবার চেষ্টা করা উচিত। রাজবন্দি বা নিরাপত্তা বন্দিদের মধ্যে যারা ডিভিশনপ্রাপ্ত তারা যেমন বিনাশ্রম কারা জীবন যাপন করে, তেমনি সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের মধ্যে যারা তাদের সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষাগত মান ও পদমর্যাদার কারণে 'ডিভিশন' ভোগ করেন তাদেরও কোন কাজ করতে হয় না। তাই রাজবন্দি ও ডিভিশনভুক্ত কয়েদিরা ২৪ ঘণ্টাই অবসর থাকেন। জেল কর্তৃপক্ষ তাদের উপর কোন কাজের দায়িত্ব দেন না। তাদের থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য সাধারণ কয়েদিদের চেয়ে উন্নত ব্যবস্থা রয়েছে।

৪. আজকাল 'রাজবন্দি' পরিভাষা চালু নেই। রাজনৈতিক কারণে যাদেরকে বিনাবিচারে আটক রাখা হতো তাদেরকেই পূর্বে রাজবন্দি বলা হতো। আজকাল 'নিরাপত্তাবন্দি' বলা হয়। বিশেষ ক্ষমতার বলে বিনা বিচারে যাদেরকে আটক করা হয় তাদেরকে নাকি দেশের নিরাপত্তার জন্য বন্দি

করতে হয়। আসলে এ সবই রাজনৈতিক কারণে করা হয়; কিন্তু এ কথা সরকার স্বীকার করেন না।

এ জাতীয় বন্দিদের মধ্যে সবাই ডিভিশন পান না। যাদেরকে ডিভিশন দেওয়া হয় না তাদের অবস্থা সাধারণ কয়েদিদের চেয়ে ভালো নয়। তবে কয়েদিদের মতো শ্রমিক হিসেবে তাদেরকে কাজ করতে হয় না এবং তাদেরকে কয়েদিদের মতো সরকারি পোশাকও পরতে হয় না।

যদি কোন ব্যক্তি সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন তাহলে তাকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেওয়া হয়। কিছু লেখাপড়া জানলে তাদেরকে দিয়ে সে ধরনের কাজই নেওয়া হয়।

মুমিন আল্লাহর উপরই ভরসা করে

দুনিয়ার জীবনে বহু ধরনের আপদ-বিপদ রয়েছে। কোন মানুষই বিপন্মুক্ত অবস্থায় থাকে না। সত্যিকার মুমিন সব অবস্থায় আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে বিপদের বেদনা লাঘব করে। সে জানে যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আসে না। যেমন– পবিত্র কুরআনের সূরা তাগাবূনের ১১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "কোন মুসীবত কখনও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসে না। যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে আল্লাহ তার দিলকে হেদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে জানেন।" সে এ কথাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারোই বিপদ দূর করার ক্ষমতা নেই। যেমন– সূরা ইউনুসের ১০৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, "যদি আল্লাহ তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে, তা দূর করতে পারে। আর যদি তিনি তোমার কোন মঙ্গল চান তাহলে তার দয়াকে ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্যও কারো নেই। তিনি তার বান্দার মধ্যে যাকে চান দয়া দ্বারা ধন্য করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"

সে আরও জানে যে, আল্লাহ পাক দুনিয়ার জীবনে পরীক্ষাস্বরূপ বিপদ-আপদ দিয়ে থাকেন। যেমন– সূরা বাকারার ১৫৫ ও ১৫৬ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, "আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভয়-বিপদ, ক্ষুধা ও জান-মালের ক্ষতি এবং আয় কমিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবো। এসব অবস্থায় যারা সবর করে, যারা বিপদে পড়লে বলে, আমরা আল্লাহরই এবং আল্লাহর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, তাদেরকে সুখবর দাও।"

সুতরাং জেলকেও মুমিন আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া পরীক্ষাই মনে করে এবং এর মধ্যেও আল্লাহ কোন মঙ্গল রেখেছেন বলে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করে। কারণ সে জানে যে, পেরেশান হলে মনের যাতনা ও দেহের ক্ষতি ছাড়া আর কোন

লাভ হয় না। আপদ-বিপদকে কুরআনের উপরিউক্ত কথা অনুযায়ী গ্রহণ করলে মনের অস্থিরতা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তখন সে ধীরচিত্তে ও ঠাণ্ডা মাথায় ঐ অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আল্লাহ তাকে ঐ অবস্থায় যথার্থ করণীয় সম্পর্কে হেদায়াত দেন বলেও কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। (সূরা তাগাবূন ঃ ১১)

মুমিনের মনোবল এভাবেই মযবুত হয়। পেরেশান হয়ে বিপদের আঘাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই বলে মুমিন একমাত্র আল্লাহর ফায়সালার অপেক্ষায় থাকে। সে তাঁরই দুয়ারে ধরনা দেয়। তাঁর কাছে কেঁদেই মনের জ্বালা মিটায়। বিপদেই মনিবের কথা বেশি মনে হয় এবং তাঁকে সব সময় ডাকার প্রয়োজন বোধ হয়। তাঁকে স্মরণ করেই সান্ত্বনা পাওয়া যায়। আসলেই আল্লাহর যিকরের মধ্যেই মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায়। আল্লাহ বলেন, "যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর যিকর দ্বারাই তাদের কালব প্রশান্তি লাভ করে।" জেনে রাখো একমাত্র আল্লাহর যিকর দ্বারাই কালব শান্তি লাভ করে থাকে।" (সূরা আর রা'দ ঃ ২৮)

জেলের ফযীলত

ইচ্ছা করে কেউ জেলে আসে না। কিন্তু জেলে যদি বাধ্য হয়ে থাকতেই হয় তাহলে জেল জীবনটাকে বহু কল্যাণ লাভের জন্য কাজে লাগানো সম্ভব। যে মুমিন আল্লাহর উপর ভরসা করে তার সত্তাকে মনিবের মর্জির উপর ছেড়ে দিয়েছে তার জন্য জেলখানা এমন এক নিয়ামতে পরিণত হয়, যা জেলের বাইরে সে কখনো পায়নি।

১. পূর্ণাঙ্গ নিশ্চিত অবকাশ ঃ বিনাশ্রম কারাদণ্ড হলে তো অবসরই অবসর। কেউ তাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করাতে পারে না। তার অফুরন্ত সময় তাকে খুশি মতো যে কোন কাজে ব্যয় করার বিরল সুযোগ দান করে। এমন বেকার অবস্থা, এমন প্রচুর অবসর, সময়ের উপর এমন নিরঙ্কুশ অধিকার ভোগ করার সুযোগ জেলের বাইরে পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।
২. সকল প্রকার দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নিরুপদ্রব ও নিরিবিলি জীবন ঃ জেলের বাইরে তাকে ছোট বড় যত রকম দায়িত্বের বোঝা বইতে হতো এবং এর জন্য যত ঝামেলা পোহাতে হতো এসব থেকে বন্দি ব্যক্তি একেবারেই স্বাধীন। জেলের বাইরের স্বাধীন জীবন থেকে বঞ্চিত হওয়ার বদলে এক আলাদা ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ পাওয়া যায়। পারিবারিক দায়িত্ব তো নিত্যদিনের ঝামেলা। পরিবারের কেউ বন্দির কাছে কিছুই চায় না; বরং সবাই তার প্রতি দায়িত্ব পালনে তৎপর হয়।

জেলে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সে জন্য যা যা দরকার সবই তাকে দেবার চেষ্টা করে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন তার কাছ থেকে কিছুই দাবি করে না। সবাই তাকে মেহমান মনে করে এটা ওটা নিয়ে দেখা করতে আসে। তার পেশাগত, চাকরিগত ও অন্যান্য কোন ব্যাপারেই সামান্য দায়িত্বও তাকে পালন করতে হয় না। জেলের বাইরে কোন জীবিত মানুষ এমন দায়িত্বমুক্ত অবস্থার কথা কল্পনাও করতে পারে না।

৩. সে যদি আল্লাহর উপর ভরসা করার মতো মযবুত ঈমানের অধিকারী হয় তাহলে সব রকম পেরেশানী ও অস্থিরচিত্ততা থেকে পূর্ণ নিরাপত্তা বোধ করতে পারে। "যা ভালো আল্লাহ তাই করবেন এবং যা করবেন তাই আমার জন্য ভালো"—এ মনোভাবের মহাসম্পদ যাকে আল্লাহ দেন তার মতো সুখী আর কেউ হতে পারে না। জেল তার জন্য কোন বিপদই নয়।

৪. যত সচ্ছলই কেউ হোক আপন বাড়িতে তাকে নিজের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থার তদারক করতে না হলেও সফরে তাকে নিজেই সেদিকে নজর রাখতে হয়; কিন্তু জেলখানায় সে ঝামেলাটুকুও পোহাতে হয় না। খাওয়া ও নাস্তা যথাসময়ে হাজির হয়ে যায়। এর জন্য কোন রকম তদারকির প্রয়োজন হয় না। থাকার জন্য যা কিছু প্রয়োজন জেল কর্তৃপক্ষ সবই ব্যবস্থা করে দেয়। এর অতিরিক্ত কিছু দরকার হলে বাড়ি থেকে আনিয়ে নেওয়া যায়। অর্থাৎ জেলে নিজের খাওয়া-পরার চিন্তাও করতে হয় না।

জেলে যা হাসিল করা যায়

পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত অবস্থায় অফুরন্ত সময়কে দুর্লভ নিয়ামত মনে করলে জীবনে অনেক কিছু হাসিল (Achieve) করার সুযোগ জেলখানায় পাওয়া যায়। পরিকল্পনা করে রুটিন মতো এ মহা মূল্যবান সময়কে কাজে লাগালে জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য কী কী করা যায় সে বিষয়ে এখানে সুস্পষ্ট ধারণা দেবার চেষ্টা করছি ঃ

১. **স্বাস্থ্য চর্চা ঃ** কেউ যদি স্বাস্থ্যবিধি শতকরা একশ ভাগই রুটিন মতো পালন করতে চায় তাহলে তা শুধু জেলেই সম্ভব। এ রুটিনকে ডিস্টার্ব করার মতো কোন কারণ দেখা যায় না। জেলের বাইরে বহু কারণেই রুটিন মতো চলায় বাধার সৃষ্টি হয়। খাওয়া, শোয়া, ব্যায়াম করা, সকাল-বিকাল দৌড়ানো বা হাঁটা-চলা করা, পড়াশুনা করা, গোসল, নামায, তিলাওয়াত, যিকর, দোয়া ইত্যাদি রুটিন মতো নিখুঁতভাবে করা

সম্ভব। মনকে পেরেশান হতে না দিলে, আল্লাহর উপর ভরসা রেখে চিন্তামুক্ত থাকতে পারলে জেলখানার মতো স্বাস্থ্য বানাবার সুযোগ আর কোথাও নেই। এ কারণেই জেলে অসুখ-বিসুখও কম হয়। আর অসুখ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা তো আছেই।

২. **পড়াশুনার মহাসুযোগ ঃ** যাদের পড়ার অভ্যাস আছে তাদের জন্য জেলখানায় সময় কাটানো খুবই সহজ। জেলের লাইব্রেরিতেও সব রকম বই-ই আছে। কেউ পড়তে চাইলে বইয়ের কোন অভাব নেই। বাড়ি থেকেও বই আনিয়ে নেওয়া যায়। বিজ্ঞানের ডিগ্রি ছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ডিগ্রি নেবার জন্য পড়াশুনা করলে জেলেই পরীক্ষা নেবার সুব্যবস্থা রয়েছে। কয়েক বছর জেলে আটক থাকার মতো অবস্থায় পড়লে যে কোন বয়সের লোকই ডিগ্রি বাড়াতে পারে।

৩. **বই লেখার অবকাশ ঃ** দুনিয়ার অনেক মনীষীই জেলখানার অবসর জীবনে বই লিখে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। লেখার জন্য যে বিরামহীন অবসর সময় দরকার হয় তা শুধু জেলেই পাওয়া সম্ভব।

৪. **আন্দোলন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার সুযোগ ঃ** যারা কোন আন্দোলনে সক্রিয় তাদের জন্য জেলখানা বড়ই উপকারী। বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় যারা তাদের জন্য এ সুযোগ পাওয়াটা জরুরি বললেও অত্যুক্তি হয় না। ধীরে সুস্থে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা, আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশুনা ও গবেষণা চালানো, সুস্থিরভাবে পরিকল্পনা রচনা করা ইত্যাদির জন্য জেলখানা বিরল সুযোগ দান করে।

৫. **কুরআন মুখস্থ করার পরিবেশ ঃ** কুরআন পাকের কোন সূরা বা কোন অংশ মুখস্থ করার জন্য প্রথমত সময় দরকার। মুখস্থ করার পর তা স্থায়ীভাবে মনে রাখার জন্য প্রচুর মশ্‌ক বা অনুশীলন প্রয়োজন। মশ্‌ক করার জন্য নামাযে পড়া সবচেয়ে বেশি সহায়ক। যত বেশি সূরা মুখস্থ করা হয় ততই বেশি সময় নামাযে মশ্‌ক করতে হয়। নামাযের জন্য তাহাজ্জুদের সময় ছাড়াও পাঁচ ওয়াক্তেই যত বেশি সময় ইচ্ছা নামাযে ব্যয় করা জেলেই সম্ভব। কুরআন মুখস্থ করার চেয়ে মনে রাখাই বেশি কঠিন। রমযান মাসে হাফিয সাহেবগণ তারাবীহ্‌তে কুরআন শোনাবার সুযোগ না পেলে ঠিকমতো হিফয রাখা অসম্ভব। জেলে বার বার নামাযে মুখস্থকৃত সূরা পড়ার সময় পাওয়া যায় বলে মশ্‌ক করাটা সহজ। কেউ যদি কয়েক বছর জেলে থাকতে বাধ্য হয় তাহলে তার পক্ষে হাফিযে কুরআন হওয়াও সম্ভব।

৬. **আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ হবার পরিবেশ ঃ** জেলখানার সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে স্ত্রী, পুত্র-পরিজন ও মহব্বতের সব মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যখন অসহায় মন ঐ সত্তাকে তালাশ করে, যিনি সব অসহায়ের একমাত্র সহায়। আল্লাহ তিনিই, যাকে মানুষ সবদিক থেকে নিরাশ হওয়ার পর একমাত্র আশার স্থল মনে করে। আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে কুরআনে বেশ কয়েক জায়গায় উদাহরণ পেশ করে দেখানো হয়েছে যে, মানুষ চরম নৈরাশ্যের সময় একমাত্র আল্লাহকেই একনিষ্ঠভাবে ডাকে।

জেলখানার উঁচু দেয়াল যখন আপনজনদেরকে আড়াল করে রাখে তখন সেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কারোই আসা সম্ভব হয় না। সবাইকে হারিয়ে এখানে ঐ একজনকেই কাছে পাওয়া যায়। অগতির গতি, নিরুপায়ের উপায়, নির্জনের বন্ধু, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ও হতাশের আশা হয়ে তিনিই বিষণ্ণ হৃদয়কে উৎফুল্ল করে দেন।

আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করার উদ্দেশ্যে যারা নির্জনে থাকার জন্য নিজের ইচ্ছায় বনবাসে যান বা চিল্লায় বসেন তারা কৃত্রিম উপায়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করেন তা স্বাভাবিকভাবেই জেলখানায় পাওয়া যায়। তাই জেলে নামাযের স্বাদই আলাদা। জেলখানার তাহাজ্জুদ বাইরে কিছুতেই আশা করা যায় না। শেষ রাতে মহান মনিবের দরবারে ধরনা দিতে গিয়ে যখন চোখে বন্যা ছুটে তখনকার প্রশান্তি ও তৃপ্তির কোন তুলনা নেই। বন্দি জীবনে খালিক ও মালিকের সাথে ঘনিষ্ঠতার স্বাদ না পেলে মানুষের মন হতাশার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যাবারই কথা। এ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অগ্নিকুণ্ডকে বাগানে পরিণত করেছে। দয়াময় জেলখানাকেও বেহেশতের টুকরা বানাতে সক্ষম।

৭. **দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালন ঃ** আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকার দায়িত্ব যে পালন করে তার জন্য জেলখানাও কাজের ময়দান। এখানে জেলের কর্মকর্তা, পাহারাদার ও কয়েদিদের সাথে মেলামেশা ও কথা বলার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে জেলে এ কাজে কোন বাধা নেই। হিকমতের সাথে দাওয়াত দেওয়ার যোগ্যতা থাকলে এখানে কাজের ময়দান যথেষ্ট প্রশস্ত। অসহায় কয়েদিদেরকে আল্লাহর আশ্রয় নেওয়ার দাওয়াত দিলে সহজেই তা তাদের দিলকে আকৃষ্ট করে। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে হযরত ইউসুফ (আ)-এর উদাহরণ বড়ই আকর্ষণীয়।

জেলের সাথে সম্পর্কিত যত মানুষ রয়েছে তারা যদি কোন বন্দির আচার-ব্যবহার, চাল-চরিত্র ও অভ্যাসে এমন কিছু দেখতে পায়, যা মানবীয় গুণের পরিচয় বহন করে তাহেল মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। মৌখিক দাওয়াতী কাজের চেয়ে সুন্দর আচরণ আরও বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে। নিরাপত্তা বন্দিদের প্রতি সবারই শ্রদ্ধাবোধ থাকার কারণে তার সাথে কথা বলার আগ্রহ অনেকেরই হয়। তখন তাকে এ কথা বুঝাবার সুযোগ পাওয়া যায় যে, কেন বিনাবিচারে তাকে আটক করে রেখেছে। এ উপলক্ষে সুন্দরভাবে ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

জেল জীবন কি কামনার বিষয়?

জেলের ফযীলত ও জেল জীবনে যা হাসিল করা যায় সে বিষয়ে আমার লেখা পড়ে কেউ এ ধারণা করবেন না যে, আমি জেলে আসবার জন্য পাঠকগণকে উসকে দিচ্ছি অথবা জেল জীবন কামনা করার জন্য প্রেরণা দিচ্ছি। ব্যাপার মোটেই তা নয়। বন্দি জীবন দুনিয়ার কঠিন পরীক্ষাগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান। বন্দি হবার ফলে পরিবার-পরিজনও বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। বন্দির ব্যবসা, পেশা বা চাকরির মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কাও রয়েছে। পরিবার থেকে বাধ্য হয়ে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে যে মানসিক যাতনা ভোগ করতে হয় তা বড়ই করুণ। সুতরাং বন্দি জীবন কোন অবস্থায়ই কামনার ধন নয়। অবশ্য হযরত ইউসুফ (আ) এক বিরাট ফিতনা থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আল্লাহ তাআলার নিকট জেল কামনা করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ছোট-বড় কোন বিপদই কামনা করা উচিত নয়। বিপদ মাত্রই পরীক্ষা। আল্লাহ্ তাআলার নিকট বিপদ চাওয়া অস্বাভাবিক। এক সাহাবী আল্লাহ পাকের নিকট সবরের জন্য বেশি বেশি দোয়া করছিলেন। রাসূল (স) তাঁকে বললেন, আল্লাহর কাছে বেশি করে আফিয়াত (স্বাচ্ছন্দ্য-শান্তি, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি) চাও। বেশি সবর চাওয়া মানে তো বিপদের পরীক্ষা চাওয়া। তবে পরীক্ষা আসলে অবশ্যই সবর চাওয়া দরকার।

আমার লেখার উদ্দেশ্য হল, যদি জেলে বন্দি হবার মতো কঠিন বিপদ এসেই পড়ে, তাহলে এ বিপদে বেসবর না হয়ে এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য চেষ্টা করার প্রেরণা দান করা। এ অগ্নিপরীক্ষায় জীবনের যাবতীয় খাদ পুড়িয়ে নিজকে খাঁটি সোনায় পরিণত করার সাধনা কীভাবে করা যায় সে বিষয়ে ইশারা করাই আমার লক্ষ্য। জেল হয়ে গেল বলে ঘাবড়াবার কিছু নেই। বিপদ আল্লাহর

ইচ্ছা ছাড়া আসতে পারে না। ঘাবড়ালে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায় না। তাঁর উপর ভরসা করে মনকে শান্ত রাখলে এ পরিস্থিতিতে যা করা উচিত সে বিষয়ে আল্লাহ্ হেদায়াত দান করবেন। এ কথাই সূরা আত তাগাবূনের ১১ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

জেলের প্রস্তুতি

১. ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় সবারই এ মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন যে, এক সময় জেলখানায় সরকারের মেহমান হওয়ার সুযোগ আসতে পারে। যারা নেতৃস্থানীয় তারা তো গোয়েন্দা পুলিশ দপ্তরে তালিকাভুক্তই থাকেন। সরকারের নির্দেশ পেলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু সাধারণ কর্মী এমনকি সক্রিয় সমর্থকদেরকেও কোন কোন সময় বিক্ষোভ মিছিল থেকে ধরে নিয়ে জেলে পুরে ফেলে।

   ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীদের সাথে তো হামেশাই এ ব্যাপারটা ঘটছে। তাদের অফিস থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে তারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ তাদেরকেই ধরে নিয়ে যায়। তাই শিবিরের সবাইকে জেলের দাওয়াত কবুলের জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

   জেলখানা এমন এক জায়গা, যেখানে আসবার আগে ভয় থাকলেও কিছুদিন জেলে থাকার পর সে ভয় ধীরে ধীরে চলে যায়। বিশেষ করে আন্দোলনের প্রতি আন্তরিকতা থাকলে সাহস আরও বেড়ে যায়। একবার যারা কিছুদিন জেল খেটে মুক্তি পায় তারা জেল পাস করে বের হবার ফলে জেলের ভয় চিরতরে দূর হয়ে যায়। বিনাবিচারে আটক রাখার কালা-কানুন বলে কমপক্ষে এক মাস আটক রাখার পর কাউকে ছেড়ে দেয়। কারো আটকাদেশের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়। তাই আন্দোলনরত সবাইকে জেলের ভয় মন থেকে দূর করে এর জন্য মনকে তৈরি করে রাখতে হবে। তা না হলে পুলিশের ভয়ে আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে না।

২. সরকারের সাথে বিরোধের কোন এক পর্যায়ে নেতৃস্থানীয়দেরকে গ্রেপ্তার করার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সরকারের আচরণ থেকেই তা বুঝা যায়। তখন নিম্নরূপ প্রস্তুতি নিয়ে রাখা দরকার, যাতে হঠাৎ গ্রেপ্তার হবার কারণে অসুবিধায় পড়তে না হয় ঃ

ক. দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়, তেল-সাবান, দাঁতের মাজন, অর্থাৎ সাংগঠনিক সফরে যেতে যেসব জিনিস সাথে রাখতে হয় এর তালিকা তৈরি করে স্ত্রীর কাছে রাখতে হবে। যদি বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে তো নিজেই সব জিনিস গুছিয়ে নিতে পারবেন। অন্যত্র গ্রেপ্তার হলে বাড়ির লোকেরা ঐ তালিকার জিনিস পৌঁছে দেবে।

খ. লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ-কলম ও অন্যান্য সরঞ্জামের তালিকা করে রাখতে হবে। বিশেষ করে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ যেসব বই পড়বার সময় পাওয়া যায়নি এর তালিকা করে বইগুলো আলাদা করে রাখতে হবে, যাতে প্রয়োজন হলে বাড়ির লোকই তা জেলে পাঠাতে পারে।

গ. কয়েকশ টাকা জেলে আসবার সময় সাথে আনা দরকার। জেল অফিসে এ টাকা জমা করতে হয়। পরে কোন জিনিস বাজার থেকে কিনে আনতে বললে জেল অফিস ব্যবস্থা করে দেয়।

জেলের কিছু অভিজ্ঞতা

জেলে তিন ধরনের লোকদের সাথে যোগাযোগ ও মেলামেশার সুযোগ হয় ঃ

১. জেল কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা ঃ যেমন ডিআইজি, জেলার ও ডেপুটি জেলার।

২. জেল ওয়ার্ডেন ঃ সুবেদার, জমাদার ও সিপাই।

৩. সাধারণ কয়েদি, যারা সাজাপ্রাপ্ত।

প্রথমে জেল কর্মকর্তাদের সম্পর্কে বলছি। দেশের প্রতি বিভাগে একটি কেন্দ্রীয় জেল আছে। সেখানে ডিআইজি হলেন প্রধান প্রশাসক। তিনি কেন্দ্রীয় জেলের অভ্যন্তরীণ সব ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করতে পারেন। এর পরই জেলার ও ডেপুটি জেলারদের স্থান। জেলা শহরের জেলখানায় সুপার বা জেলারই প্রধান প্রশাসক।

নিরাপত্তা বন্দি বা রাজবন্দি এবং ডিভিশনপ্রাপ্ত কয়েদিদের নিকট সাধারণত সপ্তাহে একবার প্রধান প্রশাসকের নেতৃত্বে সব কর্মকর্তাই পরিদর্শন উপলক্ষে আসেন। তখন তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়। কোন সমস্যা থাকলে তুলে ধরা যায়। কর্মকর্তাদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে কথা বললে তারা কথা শুনেন ও সমস্যা সমাধানে যত্নবান হন।

এরপর ওয়ার্ডেনদের কথায় আসা যাক। এরা হল জেল পুলিশ। এরা পাহারাদার এবং সাধারণ পুলিশের মতোই দায়িত্ব পালন করে। সরকারি পরিভাষায় এদেরকে ওয়ার্ডেন বলে। জেলের কয়েদিরা তাদেরকে 'মিয়া সাব' বলে সম্বোধন করে। এদের সাথে সাধারণ কয়েদিরাও কথা বলার সুযোগ পায়। এরা নিরাপত্তা বন্দিদেরকে শ্রদ্ধা করে এবং কথা বলার সুযোগ পেলে খুশি হয়। এদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করা সবচেয়ে সহজ।

এ পাহারাদারদেরকে তদারকি করার জন্য জমাদার রয়েছে। সিপাইরা তাদেরকে 'উস্তাদ' বলে সম্বোধন করে। নিরাপত্তা বন্দি ও ডিভিশনপ্রাপ্ত কয়েদিদের সাথে জমাদাররা খুব মেলামেশা করার সুযোগ গ্রহণ করে। তাদের মধ্যেও দাওয়াতী কাজ করা যায়। সুবেদার কেন্দ্রীয় জেলে ২/৩ জনের বেশি থাকে না। জেলা কারাগারে মাত্র একজন থাকে। তাদের সাথেও খোলামেলা আলোচনা করা যায়।

সুবেদার থেকে প্রমোশন পেয়ে 'সার্জেন্ট' পদ পায়। শুধু কেন্দ্রীয় কারাগারেই এ পদে একজন মাত্র দায়িত্ব পায়। জেল গেটেই তার প্রধান দায়িত্ব।

জেলের কয়েদিদেরকে নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। নিরাপত্তা বন্দি ও ডিভিশনের কয়েদিরাও জমাদারের সহযোগিতা ছাড়া নিজ এলাকার বাইরে যেতে পারে না। তবে অনেক সাধারণ কয়েদিও তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ পায়। বিভিন্ন কাজ উপলক্ষে সাধারণ কয়েদিকে নিরাপত্তা ও ডিভিশন বন্দির কাছে আসতে হয় ঃ

১. মধ্যবিত্ত পরিবারে যেমন বেতনধারী কাজের লোক থাকে, যারা বাড়ির সব রকম কাজ-কর্ম করে, তেমনি নিরাপত্তা ও ডিভিশন বন্দিদের খিদমতের জন্য সাধারণ কয়েদি নিয়োগ করা হয়। এরা ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে বিছানা ও কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখে, কাপড়-চোপড় ধুয়ে দেয়, খাবার ও নাশতা পরিবেশন করে। দিনের বেলা সব সময় এরা খিদমতে নিয়োজিত থাকে, বিকালে নিজ নিজ ওয়ার্ডে চলে যায়। রাতে এদের কোন খিদমত নেবার উপায় নেই। জেলের পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় 'ফালতু'।
২. রান্না ঘরের বাবুর্চি ও সহকারীরাও সাধারণ কয়েদি। নিরাপত্তা ও ডিভিশনের বন্দিদের জন্য খাদ্যের মান উন্নত বলে তাদের খাদ্য সাধারণ কয়েদিদের সাথে পাক করা হয় না। এ বন্দিদের বাসস্থানের এলাকায়ই আলাদা পাকের ব্যবস্থা রয়েছে।

৩. দিনের বেলায় বিভিন্ন কাজের জন্য কয়েদিরা আসে। বাগানে কাজ করা, ঝাড়ু দেওয়া, টয়লেট পরিষ্কার করা, পত্রিকা বিলি করা, হারিকেন দিয়ে ও নিয়ে যাওয়া, ধোপাখানায় কাপড় নিয়ে যাওয়া, চুল কাটতে আসা ইত্যাদি উপলক্ষে যেসব কয়েদি আসে তাদের সাথেও কথা বলা যায়।

এভাবে অনেক সাধারণ কয়েদির সাথে মিলবার সুযোগে তাদের হাল-অবস্থা জানা যায়। তারা একটু সহানুভূতি পেলে খুবই খুশি হয়। খাবার মতো কোন জিনিস সামান্য একটু দিলে ধন্য হয়। এদের মধ্যে নির্দোষ লোকও যথেষ্ট রয়েছে, যারা মিথ্যা মামলায় সাজা পেয়েছে। এদের মতো মযলুম মানুষ আর হয় না। তাদের সাথে আলাপ করে আমাদের সমাজের দুরবস্থা উপলব্ধি করা যায় এবং সমাজের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করার প্রেরণা লাভ করা সম্ভব হয়।

-সমাপ্ত-